International Peer Review Journal
ISSN 2321-7340(Print) & E-Journal Virson

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

(The Source of Folk)
E-Journal Virson
Vol.-1: Issue-1: 2022

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

উপজনভুই পাবলিশার্স
মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

লোক-উৎস, ১ম সংখ্যা # *E-Journal*_130

স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতি ও আদিবাসী সমাজ

সুব্রত বাড়ুই

স্বাধীনতালাভের পর থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত তথাকথিত উত্তরবঙ্গে কোন বড় এমনকি মাঝারি শিল্পও গড়ে ওঠেনি। তাই ডত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক রূপান্তরের একমাত্র মাধ্যম হল কৃষি। এসময় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে থ্রি টি (Three T) কথাটি সমর্থক ভাবে তুলে ধরা হত। এর মানে একটি টি হল টিম্বার বা গাছ, বনাঞ্চল; ট্রি বা চা, চা-বাগান; আর একটি টি হল টোব্যাকো বা তামাক। যা এক সময় এই অঞ্চলের অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আজ বনাঞ্চল প্রায় ধ্বংসের মুখে, চা বাগানগুলির করুণদশা এবং টোব্যাকো বা তামাক চাষ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে সামান্য কিছু অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই চিরাচরিত অর্থনীতি ধ্বংসই নতুন করে আধুনিক কৃষি অর্থনীতির দিকে উত্তরবঙ্গের গ্রমা অঞ্চলকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কৃষিকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হয় নতুন নতুন শহরের। যার মধ্যে হলদিবাড়ি, ধুপগুড়ি, বিধাননগর, খড়িবাড়ি, নবাবগঞ্জ, বিকোর মোহিনীগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জরনাম করা যেতে পারে। আলোচ্য নিবন্ধে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষ করে আশি ও নব্বই এর দশকে উত্তরবঙ্গের কৃাি অর্থনীতির কীভাবে বিকাশ লাভ করলতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। এমনকি এই কৃষি অর্থনীতির উন্নতির পেছনে কৃষিজীবি অভিবাসী সমাজের ভুমিকাইবা কতটুকু, এমনকি তারা কীভাবে করে অন্যান্য সমাজের সঙ্গে কৌশল আদানপ্রদানের ভিত্তিতে নিষ্ফলাঅঞ্চল সুজলা সুফলা করেছে তাও লক্ষণীয়। যদিও আলোচনার পরিসর বৃহৎ শব্দবন্ধনীর প্রেক্ষাপটে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী বিশেষকরে আশির দশক থেকে বর্তমান কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতিরএক ব্যাপক পরিবর্তম লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অনেকাংশেই অনালোচিত চর কৃষি অর্থনীতি। নদীর তীরবর্তী বালুচরে যে কৃষিকাজ সম্ভব এবং এর মধ্য দিয়ে কটষি অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিস্তা জলঢাকা প্রভৃতি নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষকেরা। তাদের কষ্টসাধ্যপরিশ্রমের ফলশ্রুতি সবজি বাজারের একটি বড় অংশ দখল করে আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে আলুচাষের ক্ষেত্রে একবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। হলদিবাড়ির লঙ্কা, বিধাননগরের আনারস, বিকোর ও নবাবগঞ্জের বেগুন চাষ, কালিয়াগঞ্জ হলদিবাড়ির কাচালঙ্কা, মোহিনীগঞ্জ এর তুলাইপাঞ্জি

চালপ্রভৃতি অর্থনীতির অন্যমাত্রা যোগ করেছে। সত্তর আশিরদশকের চিনা কাউন চাষ, আধপেটা খাওয়া কথাগুলি শব্দভাণ্ডার থেকে উঠে গেছে। গরীবের সংখ্যা কতটা কমেছে না কমেনি তা আলোচনার বিষয়, তবে এটা ঠিক যে বিগত দশকগুলির তুলনায় বর্তমানকালে কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষিপ্রদ্ধতিতে আমূলপরিবর্তন এসেছে। এখন প্রশ্ন হল এই পরিবর্তনের কারণ কি? কোন একটি দুটি কারণে কৃষিক্ষেত্রে এমন আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই উন্নতিরকারণ হল অনেকগুলি কারণে একত্রিত ফল।

দেশবিভাগের সামান্য কিছু আগে থেকেই নিরাপত্তার অভাবের জন্য অনিচ্ছা সত্বেও পূর্ব পাকিস্থানের হিন্দুরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় আসতে শুরু করেছিল নতুন জীবন গড়ে তোলার আশায়।[১] ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অনুপ্রবেশকারীরা প্রধানত উদ্বাস্তু হিসাবেই পশ্চিমবাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সাল বা তার পরেও অনুপ্রবেশকারীরা অনুপ্রবেশের বিষয়ে অনেকাংশেই বৈধতা ও আইনি সীমা লঙ্ঘন করে অবৈধতা ও বেআইনির মোড়কে নিজেকে আবৃতকরে ফেলেছিল।[২] সেখানে আইনি বা বেআইনি কোন কিছু বিচার করার মত সুযোগ তাদের সামনে ছিল না। গতশতাব্দীর মধ্যভাগের পে অসম, মেঘালয়, বাংলাদেশের মুসলিমরাও প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে সরকারী খাস জমিতে বসবাস শুরু করে।[৩] পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদেরএকটা বড় অংশ ছিল নমঃশূদ্র চাষী। প্রশাসনিকভাবে খণ্ডিত উত্তরবঙ্গের সূচনালগ্ন থেকেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তার বড় সমস্যাই হল পূর্বপাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অভিবাসন সমস্যা। উত্তরবঙ্গে শুধু পূর্বপাকিস্থানের উদ্বাস্তু নয় তিব্বতী উদ্বাস্তুদের ভারও বহন করতে হয়েছিল। ১৯৫০ সাকে যখন চিনা সেনাবাহিনী তিব্বত দখল করে তখন প্রায় লাক্ষাধিক তিব্বতী উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জালাতে আশ্রয় নিয়েছি।[৪] পূর্বপাকিস্থান থেকে উদ্বাস্তু আসার ফলে এবং ১৯৭১ সালের সময় এবং পরে শরণার্থীরা আসারপর উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই অভিবাসী কৃষিজীবীসমাজ উত্রবঙ্গে বসতি স্থাপন করে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক রুপান্তর ঘটিয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা। তবে স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে জালাগুলির জনবিন্যাসের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও সমাজ কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কারণ উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্তরগত।[৫] এই সব কথাগুলি বলা হচ্ছে অন্যকারণে, দিনাজপুর জেলার ২০টি, মালদহের ৫টি, জলপাইগুড়ির ৫টি

এবং রংপুর জেলাকে কিসের ভিত্তিতেকমিশন পাকিস্থানকে দিয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা দেবীগঞ্জ, পাটগ্রাম, বোঁদা, পচাগড় ও তেঁতুলিয়া পাকিস্থানকে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই থানাগুলিতেহিন্দু মুসলিম সংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। একটা কারণ হতে পারে, মুসলমানরা তপশিলীদেরকে তাদের সঙ্গে মনে করতেন। কারণ তপশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও নীরদরঞ্জন মল্লিক মুসলিমলীগের সঙ্গে ছিলেন। এবার আসছি রংপুর জেলার কথায়, জলপাইগুড়িতো একসময় রংপুর জেলারই অংশছিল। এই রংপুরকে বলা হত রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের হৃদয়পুর। র‍্যাডক্লিফ কমিশনের দ্বারা রাজবংশীরা তাদের হৃদয়পুরকে হারিয়ে ফেলে।[৬] রংপুর জেলার এক ইঞ্চি জমিও ভারতের মাটিতে আসেনি। যদিও রংপুরের দুইজন এবং দিনাজপুরের একজন আইনসভার সদস্য ছিলেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির। প্রেমহরি বর্মণ, নগেন্দ্রনাথ রায়ের জন্যই জলপাইগুড়ির কয়েকটি থানা এবং রংপুর পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত হয়। যে ভূলের মাশুল আজও গুনতে হচ্ছে রাজবংশী সমাজকে। ক্ষত্রিয় সমিতি যদি পাকিস্থানের দাবীকে সমর্থন না করতেন তাহলে রংপুরেরতিনটি থানা ভুরুঙ্গামারী, জলঢাকা, ডোমার এবং জলপাইগুড়ির বোঁদা, পাটগ্রাম, তেঁতুলিয়া থানা ভারতে আসতে পারত। এইসব থানাগুলি ছিল রাজবংশী অধ্যুষিত। দুঃখের বিষয় হল তিন লাক্ষাধিক রাজবংশী বসবাসকারী রংপুর জেলার রাজবংশীরা নিজেদের জন্য তিন হাত জমিও পায়নি। ক্ষত্রিয় সমিতির এই ভূল সিদ্ধান্তের জন্যই ঐ অঞ্চলের রাজবংশীদের জন্মভূমিতে চলে গেলেই, উপরন্ত উদ্বাস্তু হতে হল কয়েক লক্ষ রাজবংশী ক্ষত্রিয়কে। বর্ণহিন্দুদের উপর রাগ করে পাকিস্থানকেসমর্থনকরে নিজেরাই চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হলেন। আর এখন তাদের উত্তরাধিকারীরা স্বভূমির জন্য আত্মবিলাপ ও অনুশোচনা করে থাকেন।[৭] ক্ষত্রিয় সমিতির নেতৃবর্গ ভবিষ্যতের এই কথাটুকু যদি মনে করতেন তাহলেও রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি ভারতে আসত। তাতে রাজবংশীদের নতুন ইতিহাস নির্মাণের সম্ভবনা থাকত। এখন কথা হল এইসব উদ্বাস্তু রাজবংশীরা কোথায় গেল? দেশভাগ ও বাংলাদেশ গঠনের পর স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই সকল উদ্বাস্তু রাজবংশীদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল? এগুলো এই নিবন্ধের বিষয় নয়, তাই আলোচনার ভেতরে প্রবেশ করছি না। তৎকালীন ভারত তথা বাংলার উচ্চবর্ণীয় জাতিগুলিও নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের প্রতি জাতিবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার অনুশীলন করত, উপেন্দ্রনাথ বর্মণের ছাত্রাবস্থায় যার স্বীকার হতে হয়েছিল।[৮] জাতীয়তাবাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে জাতি অবশ্য একটি

কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত হত। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রাশ উচ্চবর্গীয় জাতিগুলির হাতেই ছিল। সুমিত সরকার তার আধুনিক ভারতে স্বদেশী আন্দোলনে উচ্চবর্ণের দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার মতের পরবর্তনও করেন। সুমিত সরকারের প্রসঙ্গ একারণেই তুলেধরা হল কারণ, কৃষি অর্থনীতি বিকাশের হাত ধরে ঔপনিবেশিককাল থেকে বাংলার জাতি ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অনেকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা শিথিল করে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা তুলে ধরা বা জাতিকাঠামোর রূপবদলের এক চেষ্টা হয়েছিল।[৯] সেখানে রাজবংশী, নমঃশূদ্র সহ অন্যান্য সম্প্রদায়গুলিকে অনেকটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকেই কাছে টেনে নেবার প্রয়োজন দেখা দেয়।কারণ উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।[১০] নমঃশূদ্ররা বাংলার হিন্দুজাতিভুক্ত নিম্নবর্গীয় সমাজের অন্যতম। সংখ্যায় বিচারে এই সম্প্রদায় অবিভক্ত পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় হিন্দুজাতিভুক্ত নিম্নবর্গ। নানারকম সামাজিক অবিচার, এমনকি উচ্চবর্ণের মানুষের থেকে দূরেই এদের সামাজিক অবস্থান ছিল।[১১] প্রাক স্বাধীনতা পর্বে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দিনাজপুরও রংপুরে বর্ণহিন্দুদের চেয়ে তপশিলী হিন্দুদের সংখ্যা ছিল বেশি। উপরক্ত স্বাধীনতা পূর্ব সেন্সাসে উপজাতি সম্প্রদায়কে প্রকৃতির উপাসক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিশিষ্ট উত্তরবঙ্গ গবেষক ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বিভিন্ন প্রবন্ধে লিখেছেন—১৯৪৭ সালের পূর্বে জমি ছিল, কিন্তু চাষবাসের অভাবে খাদ্যাভাব থেকেই যেত। এই সময়কালে রাজবংশীসহ অন্যান্য কৃষকদের আর্থিক অভাব অনটনের কথা বহুল আলোচিত। আজ অভাব অনটন অনেকটাই কমে গেছে, না খেয়েও থাকতে হয় না সকলকে। অথচ বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু ও শরণার্থীরা আসা সত্বেও খাদ্য সংকট নেই, উপরক্ত খাদ্য ও শস্যের উৎপাদন বিপুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এটা বলা যেতে পারে উদ্বাস্তু ও শরণার্থীরা আসার ফলেই এই উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি অর্থনীতির চেহারাও অনেক বদলে গেছে। অন্যভাবে তিনি আবার দেখিয়েছেন যে, এই কৃষিজীবী মানুষেরা আসার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পূর্ব পাকিস্থান বা বর্তমান বাংলাদেশ। এই কৃষক সম্প্রদায়ের শ্রমেই পূর্ববঙ্গের কৃষির উন্নতি হয়েছিল। হিন্দুদের জমি পেয়েও, সম্পদ পেয়েও তারা কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারেনি। বিষয়টি পরপর উল্লেখ করা হল এই করণে যে, পাক-স্বাধীনতা কাল থেকে এমন কি প্রাচীন যুগ থেকেই সামাজিক ভাবে উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের মধ্যে দূরত্ব হিন্দু সমাজের যেমন অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, ঠিক তেমনি রাজনৈতিক

ভাবেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক নেতারা যদি উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ ভুলে কাছাকাছি আসতে পারত, তাহলে হয়তো রাজনৈতিক সমীকরণ এমনকি দেশভাগের জ্বালা অনেকটা কম হত। কারণ যে রাজনৈতিক সমীকরণকে সামনে রেখে দেশভাগ হয়েছিল সেখানে কিন্তু নিম্নবর্ণের ক্ষতির পরিমান বেশি। বেশি বলছি এই কারণে তারা যে আশা নিয়ে দেশভাগ সমর্থন করেছিল, এমনকি মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সেই মোহভঙ্গতে খুববেশি সময় লাগেনি। অচিরেই উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল তাদেরকে। এই যে দেশ হারানোর কষ্ট, এমন এক আত্মবিচ্ছেদ, যে এর মুখোমুখি হয়নি সে কিছুতেই অনুভব করতে পারবে না। এখনকার বাংলাদেশের পঁচানব্বই শতাংশ লোক দেশভাগের কষ্ট বোঝে না। তাদের তো ভিটে মাটি ছেড়ে অন্য দেশে যেতে হয়নি। তাই তাদের দুঃখবোধ ততটা তীব্র নয়। দেশভাগটা যেন দুই পাহাড়ের মাঝে গভীর খাদে পরে গেছে।[১২]

বর্তমানে সংখ্যাতত্বের বিচারে উত্তরবঙ্গ হল অনগ্রসর সম্প্রদায়ের বাসভূমি। পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট স্তরের জন্য প্রতিনিধিদের সিংহভাগই অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যদিকে দারিদ্র সীমার নিচে যারা বসবাস করেন তাদের সিংহভাগেও এই সম্প্রদায়ের মানুষ।[১৩] উত্তরবঙ্গের অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সিংহভাগ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। এখানকার অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রচলিত সংরক্ষণী প্রথার সুযোগ পেলেও দৈনন্দিন আহার্য সংগ্রহ বেশীরভাগ সময় কাটিয়ে ফেলায় নুন্যতম শিক্ষাগত অর্জন থেকে পিছিয়ে পড়ছে।[১৪] নুন্যতম শিক্ষা এই কারনেই অপরিহার্য যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে ভালোভাবে রপ্ত করতে, সরকারী বিভিন্ন অনুদান সম্পর্কে জানতে বা বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহারের জন্য খুবেই প্রয়োজন। অনগ্রসর তপশীলি সম্প্রদায়ের রাজবংশীরা পেশাগত দিকথেকে বরাবরই কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। এমনকি গ্রামীন সামাজিক, অর্থনৈতিকও সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রতা অনেক দিন ধরে তারা আকড়ে ছিল। কৃষিকাজ ছাড়া অন্যপেশা গ্রহণ করতেও তাদের অণীহা ছিল। এই আদি কৃষক সম্প্রদায়ের হাতে কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় জমি থাকা সত্বেও তারা সেই জমিরউপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেনি। অভিবাসী সমাজের আগমনের ফলে স্থানীয় কৃষিজীবী সমাজের অর্থনৈনিক ও সামাজিক রুপান্তর ঘটে।আগেই বলা হয়েছে যে, জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিবেশি জেলাগুলোর মধ্যে কোচবিহার, রংপুর থেকেই সবচেয়ে বেশি লোক এসেছে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজবংশী কৃষক সম্প্রদায়ের।[১৫] আবার বাংদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর জেলায় আগত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের জনগনও ছিলেন কৃষিজীবী।[১৬] এমনকি দেখা যায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকের কৃষি

ছাড়াও অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত হলেও রাজবংশী জোতদারেরা জমিকে আঁকড়ে ধরেই ছিল। তাই দেখা যায়, স্বাধীনতার পর রংপুরের রাজবংশী জোতদারেরা সম্পন্ন হওয়া সত্বেও দেশ বিভাগের পর তারাও উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসে অপরিসীম কষ্টের মধ্যে পড়েছিল।[১৭] এই রাজবংশি কৃষক সম্প্রদায়ের লোকেরা জেলার কৃষি অর্থনীতির উদ্ভাবক না হলেও বর্তমানে কৃষি উৎপাদনে গুরুপ্তপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। যে স্থানীয় রাজবংশী সমাজ আধুনিক কৃষির অগ্রগতিতে পিছিয়ে ছিল, ফলে তৈরি হয়েছিল কৃষক সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য, সেই বৈষম্যকে তারও অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

এই আলোচনার কারণই হল, আধুনিক কৃষি অর্থনীতির উন্নতির পেছনে একটি আগোচরে থাকা অতিসূক্ষ্ম কারণকে তুলে ধরা। স্বাধীনতার তাৎক্ষণিক পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির তেমন তেজী পরিবর্তন ঘটে নি। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় এই সময়কালে দেশান্তরিতের বেশিরভাগই উচ্চবর্ণের। যারা কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ছিল না। স্থানীয়রাও আধুনিক কৃষি পদ্ধতি তেমনভাবে রপ্ত করতে পারেনি। পরবর্তীকালে যখন নিম্ন বর্ণের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটলো, সেই সময় কাল থেকেই উত্তরবঙ্গের কৃষি অর্থনীতির বিকাশ চমকপ্রদ হয়েছে। এমনকি তারা নিষ্ফলা বন্ধুর জমিতেও অর্থকরী ফসল ফলিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। নাহলে কে ভাবতে পেরেছিল বালুকাময় নদীর চরেও আলু, তরমুজ, লঙ্কা, বাদাম প্রভৃতির চাষ করা যেতে পারে। তবে একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, কৃষিক্ষেত্রে এই উন্নতির পেছনে কেবল একটি সম্প্রদায়েরই অবদান রয়েছে, নাকি এটা সার্বিক যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ফসল।

তথ্যসূত্র:

১। ব্রততী হোড়—'পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি'—প্রসঙ্গ সরকারী নীতি এবং পশ্চিমবাংলার প্রতিবাদ প্রতিরোধে উদ্বাস্তু আন্দোলনের গোড়ার কথা।(১৯৪৯-৫০), ইতিহাস অনুসন্ধান ২৮, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সাংসদ, সম্পাদন—সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পৃ-৫১৪

২। সন্ধিমান চক্রবর্তী—'স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশের ধারাবাহিক প্রবাহমানতা', ইতিহাস অনুসন্ধান ২৮, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সাংসদ, পৃ-৪৩৩

৩। পাপিয়া দত্ত— 'জলপাইগুড়ি জেলার অভিবাসী সমাজঃ সমন্বয় ও সংঘাতের একটি রূপরেখা(১৮৬৯-১৯৯১), কিরাতভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন(দ্বিতীয় খণ্ড), সম্পাদন—অরবিন্দ কর, পৃ-৫১৪

৪। আনন্দগোপাল ঘোষ—''স্বাধীনতা উত্তর উত্তরবঙ্গের সিকি শতাব্দীর বৃতান্ত(১৯৪৭-১৯৭২)।", ডুয়ার্সের সেতু, সম্পাদক—দ্বিজেন বিশ্বাস ও গণেশ দেবনাথ,২০১৭, পৃ-৫

৫। Rajat Subhra Mukhuapadhyay_''The Rajbanshi of North Bengal: A comparative demographic profile'', N.B.U. p-13-17

৬। ঐ, আনন্দগোপাল ঘোষ, পৃ-৫৮

৭। প্রাগুক্ত, ডঃ ঘোষ, অঙ্গীকার, পৃ-৫৯

৮। যুথিকা বর্মণ—''উপেন্দ্রনাথ বর্মণের উত্তরবাংলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি", ইতিহাস অনুসন্ধান ২৮, পৃ-৮৮৫

৯। Kastiki Dusgupta-''** politicalpartics of the **Bengal(1920-1947), Abhijit paublication, New Delhi, p-133

১০। Rajat Subhra Mukhuopadhyay-''The Rajbansis of North Bengal: A Comprative demograptic profile, N.B.U. p-15-17

১১। স্বাধীন ঝা—''জাতি ধর্ম ও সমষ্টিগত চেতনায় বাংলার নমশূদ্র আন্দোলন(১৮৭২-১৯৪৭), ইতিহাস অনুসন্ধান ২৯, পৃ-৩৮৮-৩৯৩

১২। হাসান অজিজুল হক—''মাঝে সীমান্ত থাকলে..." কাঁটাতার ৭০, আজকাল শারদ ১৪২৪, সম্পাদক—অশোক দাশগুপ্ত, পৃ-১৫

১৩। ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ—''উত্তরবঙ্গের উপেক্ষিত অনগ্রসর সম্প্রদায়" উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ ৪, ডঃ অনন্দগোপাল ঘোষ ও সুব্রত বাড়ই, সংবেদন, পৃ-৪৪

১৪। প্রাগুক্ত, ডঃ ঘোষ, পৃ-৪৬

১৫। A Running-Jalpaiguri District gazetteer, p-71

১৬। Sekhar Bandhyapadhyay-''Cast Politics and the Raj(1872-1937)'', Calcutta 1990, p-108.

১৭। ডঃ আনন্দগপাল ঘোষ—''উত্তর স্বাধিনতা পর্বের অস্থিরতার উৎস ও সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে তার প্রভাব", ভিতির, অষ্টম বর্ষ, ২০০৯, পৃ-১১৪